গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ৮ - ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ৩ টাকা পৃ. ১

সর্বব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিধানসভা গেটে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভে পুলিশের হামলা

আহত ৩৪, গুরুতর ৬, গ্রেফতার ৯০

৪ ডিসেম্বর বিধানসভার গেটে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের পুলিশ বর্বরভাবে ঘুসি চালিয়ে, লাথি মেরে, টেনে-হিঁচড়ে গ্রেফতার করে

নিয়োগ দুর্নীতি, কয়লা পাচার, গোরু পাচারের মাথাদের আড়াল করা চলবে না— এই দাবিতে ৪ ডিসেম্বর বিধানসভার গেটে আছড়ে পড়ল তুমুল বিক্ষোভ। দুশোর বেশি এস ইউ সি আই (সি) কর্মী-সমর্থক ওই দিন দুপুরে বিধানসভার উত্তর গেটে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে বিরাট পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে স্লোগান তোলেন— দুর্নীতিগ্রস্তদের গ্রেফতার করো, মূল্যবৃদ্ধি রদ করো, সারের কালোবাজারি বন্ধ করো, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের লুঠের যন্ত্র স্মার্ট মিটার চালু করা চলবে না, শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য ডিএ দিতে হবে ইত্যাদি। শান্তিপূর্ণ এই বিক্ষোভে প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয় পুলিশ। তারা যথেচ্ছভাবে বিশেষত বিক্ষোভকারীদের তলপেট লক্ষ্য করে লাথি ঘুসি মারতে থাকে, তিনজন মহিলা কর্মীর জামা ছিঁড়ে দেয়। এরপরেও বিক্ষোভ দমাতে না পেরে লাঠির ঘায়ে অনেককে আহত করে। আহত হন ৩৪ জন বিক্ষোভকারী। তাদের মধ্যে ৬ জনের আঘাত গুরুতর, একজনকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে পুলিশই নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পুলিশ ৯০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে।

ধারাবাহিক আন্দোলনের ডাক

- ৫ ডিসেম্বর সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস
- ৬ ডিসেম্বর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস
- ডিসেম্বর মাস থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান
- ৪ জানুয়ারি জেলায় জেলায় মহকুমা দফতরে বিক্ষোভ
- ৬ মার্চ কলকাতায় আইন অমান্য

কলকাতা মেডিকেল কলেজে পুলিশের আক্রমণে গুরুতর আহত কর্মী

পুলিশ যে ভাবে মহিলাকর্মীদের জামাকাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে তার প্রতিবাদ জানিয়ে দলের পক্ষ থেকে জাতীয় ও রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের কাছে দাবি জানানো হয়, বিক্ষোভরত মহিলাদের সাথে অশালীন আচরণকারী পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই অত্যাচারকে ধিক্কার জানিয়ে ওই দিনই

চারের পাতায় দেখুন

রেশনে বিনামূল্যে চালের জোগান আরও ৫ বছর

তবে কি প্রধানমন্ত্রী বুঝলেন খালি পেটে ধর্ম হয় না

ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ সহ কয়েকটি রাজ্যের নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছিলেন, রেশনে প্রতি মাসে কার্ড প্রতি ৫ কেজি করে খাদ্যশস্য সরবরাহ করার কর্মসূচি তিনি আগামী পাঁচ বছর, অর্থাৎ ২০২৮ সাল পর্যন্ত চালিয়ে যেতে চান। দেশে কেউ ক্ষুধা নিয়ে ঘুমোতে যাক —এটা তিনি নাকি চান না! চমৎকার স্বীকারোক্তি! প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণার দ্বারা সরাসরিই স্বীকার করে নিলেন দেশে বিরাট সংখ্যক মানুষ ক্ষুধার্ত। স্বীকার করে নিলেন, যে ৮১ কোটি মানুষ প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় কয়েক বছর ধরে রেশনের চাল পেয়ে আসছেন, তাঁদের খাদ্য নিরাপত্তা নেই। সরকার রেশনে খাদ্য না দিলে এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে ক্ষুধা নিয়েই ঘুমোতে যেতে হবে। এই ঘোষণার দ্বারা প্রধানমন্ত্রী এও দেখিয়ে দিলেন বিধানসভা ভোটে বিজেপির জয়কে যতই তিনি উন্নয়নের জয় বলুন না কেন, তাঁর রাজত্বকালে মানুষের অবস্থা কেমন শোচনীয়! দেখা গেল, স্বাধীনতার ৭৫ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার আয়োজিত 'অমৃত মহোৎসব'-এর রোশনাই সিংহভাগ মানুষের আর্থিক দৈন্য ঢাকতে পারেনি।

এই ঘোষণাটি প্রধানমন্ত্রী করেছেন কোথায়? বিজেপির নির্বাচনী মঞ্চে। তিনি পার্লামেন্ট থেকে এ ঘোষণা করেননি। নির্বাচিত সাংসদদের সাথে আলোচনা করে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। স্বাভাবিকভাবেই একে ভোটের চাল বলছেন অনেকেই।

দুয়ের পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী বুঝলেন খালি পেটে ধর্ম হয় না

একের পাতার পর

ভোট একটা গণতান্ত্রিক অধিকার। তাই স্বাধীনভাবে নাগরিকের সচেতন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার পরিবেশ বজায় রাখা একটা সুস্থ নির্বাচন ব্যবস্থায় কাম্য। প্রধানমন্ত্রী ঠিক এই জায়গাটাতেই মারাত্মক আঘাত করলেন। মানুষের আর্থিক দুর্দশার সুযোগ নিয়ে সামান্য চালের বিনিময়ে প্রভাবিত করে তাঁদের ভোট নিজের দলের দিকে টানার এক হীন ষড়যন্ত্র করলেন।

ভোটের জন্য খয়রাতি এখন সারা দেশে চালু করে দিয়েছে ভোটসর্বস্ব সব দল। তামিলনাড়ুতে জয়ললিতার 'আম্মা ক্যান্টিন' বা 'দু-টাকার চাল' দেওয়া, নানা সুবিধা দেওয়া এখন সব রাজ্যেই ভোট কেনার প্রচলিত মাধ্যম। যতদিন যাচ্ছে, ভোটের আগে ব্যক্তি ধরে ধরে গিফট দেওয়ার ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। এক একটা ভোটের জন্য কে কত বেশি দাম দিতে পারে তার নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা চলছে। সদ্য অনুষ্ঠিত পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে যা নগ্ন ভাবে ঘটেছে। মধ্যপ্রদেশে বিজেপি, 'লাডলি বহেনা' স্কিমে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মহিলাকে মাসে ১২৫০ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কংগ্রেসও নারী সম্মান যোজনার নামে ১৫০০ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কংগ্রেস বেশি দিচ্ছে জেনে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মাসে ৩০০০ টাকা করে দেওয়ার। ভোটকে এরা নিলামের জায়গায় নিয়ে এসেছে। পুঁজিবাদের দৌলতে ভোটাধিকার হয়ে গিয়েছে কেনাবেচার পণ্য। তৃণমূল কংগ্রেস এ রাজ্যে যে পাঁচ টাকার ডিম-ভাতের লঙ্গর চালাচ্ছে বা ইমাম ভাতা, পুরোহিত ভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ইত্যাদি প্রকল্প চালাচ্ছে— অথবা কৃষক বন্ধু প্রকল্পে কিছু নগদ অর্থ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে— তার রাজনৈতিক দিকটি অবশ্যই গণতন্ত্রের মর্যাদাকে অবনমিত করে ভোট ক্রয়। কিন্তু এর একটি অর্থনৈতিক দিকও আছে।

কেন টাকার বিনিময়ে ভোট কেনা হচ্ছে? যে বিজেপি উগ্র হিন্দুত্বে মাতিয়ে ভোট করার নজির গড়েছে, মন্দির বানাচ্ছে, মুসলিম বিদ্বেষী আওয়াজ তুলে মেরুকরণ ঘটাচ্ছে, ব্রিগেড মাঠে গীতা পাঠের কর্মসূচি নিয়েছে, সেই বিজেপিকে কেন নানা প্রকল্পের ছদ্মবেশে জনগণকে অর্থ ভিক্ষা দেওয়ার কর্মসূচি নিতে হচ্ছে? কারণ, জনজীবনে প্রবল অর্থনৈতিক সঙ্কট জীবনের অন্য সমস্যাগুলিকে ছাপিয়ে উঠছে। খালি পেটে তো আর ধর্ম হয় না! ধর্মের মালা জপ করে কম দামে জীবনদায়ী ওষুধ পাওয়া যায় না। কাজ চাই, চাকরি চাই, ন্যায্য মজুরি চাই, বিনামূল্যে শিক্ষা-চিকিৎসা চাই— জনগণের এই সব দাবি পূরণের কোনও প্রতিশ্রুতি বা দিশা কোনওটিই বিজেপির ঝুলিতে নেই। বরং জ্বলজ্বল করেছে ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা। বছরে ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি ভাঁওতা বলে প্রমাণিত হয়েছে। মোদি ক্ষমতায় আসার আগে গ্যাস সিলিন্ডার সাড়ে চারশো টাকায় পাওয়া যেত। এর দাম এখন হাজার টাকার কাছাকাছি। সরকারি ভর্তুকি কমাতে কমাতে ১৯ টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। মোদির ৯ বছরের শাসনে লাভবান হয়েছে কেবল আদানি, আম্বানিদের মতো একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই। আবার রাজ্যে রাজ্যে যে দলগুলি ক্ষমতায়, তাদের শাসনও পুঁজিপতিদেরই সুবিধা দিচ্ছে! আর এই পুঁজিপতি তোষণের সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে জনসাধারণের উপর। ফলে সর্বত্র প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া। এই ক্ষোভকে প্রশমিত করে ভোট পেতেই সব রাজ্যে খয়রাতি প্রকল্পের ছড়াছড়ি।

খয়রাতি প্রকল্প পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রয়োজনেই। এই প্রয়োজনটি বুঝতে, অক্সফাম রিপোর্টের দিকে তাকাতে হবে। অক্সফাম রিপোর্ট দেখিয়েছে, ভারতের জাতীয় সম্পদের ৪১ শতাংশের মালিক জনপিরামিডের সবচেয়ে উপরের অংশে থাকা ১ শতাংশ। আর ৫০ শতাংশ সাধারণ মানুষের সম্পদ মোট জাতীয় সম্পদের ৩ শতাংশ। এই যে বিভাজন, এই যে বিরাট বৈষম্য, এটা তো আকাশ থেকে পড়েনি। এটা বিদ্যমান পুঁজিবাদী শোষণ-শাসনেরই ফল। স্বাধীনতার ৭৫ বছর ধরে যে শাসন ধারা কংগ্রেস ও বিজেপি পালাক্রমে চালিয়ে যাচ্ছে, তার সম্মিলিত ফল জনগণের এই আর্থিক দৈন্য এবং পুঁজিপতিদের বিপুল ধনস্ফীতি— যা অক্সফাম রিপোর্টে ধরা পড়েছে।

আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রায় প্রতিটি পণ্য থেকে যে জিএসটি আদায় করে থাকে তার ৬৪ শতাংশ দিয়ে থাকে নিচের দিকের ৫০ শতাংশ মানুষ। আর উপরের দিকে ১০ শতাংশ মানুষ, যারা অতি ধনী তারা মাত্র ৩ শতাংশ দেয়। অর্থাৎ যাদের সম্পদ কম, তাদের উপরই ট্যাক্সের বোঝা বেশি। আর যারা বিপুল সম্পদের মালিক তাদের দিতে হয় সামান্য ট্যাক্স। এই যে সাধারণ মানুষের উপর বিপুল ট্যাক্সের বোঝা, সেটা কমানোর কোনও ইচ্ছা বা চেষ্টা কোনও সরকারেরই নেই। ফলে বৈষম্য বেড়েই চলেছে।

এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মোদিজি ঘোষণা করেছেন, ২০২৯ সালের মধ্যে ভারতকে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে উন্নীত করতে চান। সে জন্য অর্থনীতিকে তিনি এই সময়ের মধ্যে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে নিয়ে যেতে চান। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটুক— সবাই চায়। কিন্তু তার সুফল কী ভাবে ৮১ কোটি মানুষের জীবনে পৌঁছবে? এর দ্বারা কি তাঁদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে? তাঁদের ভেঙে পড়া খাদ্য নিরাপত্তা কি মজবুত হবে? বিশ্ব অর্থনীতির প্রথম, দ্বিতীয় শক্তিশালী দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক সঙ্কট কি আদৌ দূর হয়েছে? করোনা অতিমারি দেখিয়ে দিয়েছে সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ আমেরিকার ভিতরের চেহারাটা। লাখে লাখে মানুষ বিনা চিকিৎসায় মরছে। কারণ, পুঁজিপতিদের স্বার্থে পরিচালিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের স্বার্থ নির্ভর করে জনস্বার্থ লঙ্ঘনের উপর। ফলে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি দেশের সাধারণ মানুষের কোনও কাজে আসবে না। অবশ্য তা বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতের পুঁজিপতিদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা বাড়াবে— এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়।

অক্সফাম রিপোর্ট ভারতের সাধারণ মানুষের যে অর্থনৈতিক সঙ্কট তুলে ধরেছে, সেই প্রেক্ষাপটে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর থেকেও সাধারণ মানুষের আশা করার বিশেষ কিছু নেই। শিল্পমেলা, শিল্পসম্মেলন ইত্যাদি করার মধ্য দিয়ে লগ্নি ও চাকরির আশা জাগানোর চেষ্টা হলেও সেগুলি কোনও কাজে আসছে না। কারণ অর্থনীতি ঝিমোচ্ছে। ঝিমিয়ে পড়া পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সাময়িকভাবে হলেও খানিকটা চাঙ্গা করার জন্য সরকারি ব্যয়বৃদ্ধির তত্ত্ব দিয়েছিলেন অর্থনীতিবিদ কেইনস। সেই তত্ত্ব অনুযায়ী সরকার বিভিন্ন খয়রাতি প্রকল্পে টাকা বরাদ্দ করে থাকে। উপভোক্তাদের কাছে টাকা পৌঁছলে তাকে কেন্দ্র করে অভ্যন্তরীণ বাজার খানিকটা চাঙ্গা হয়। পুঁজিপতিদের মাল বিক্রি গতি পায়। ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প, গরিব কল্যাণ যোজনা ইত্যাদি এই তত্ত্বেরই ব্যবহারিক প্রয়োগ। ফলে বাইরের দিক থেকে প্রকল্পগুলির একটা জনদরদি মুখোশ থাকলেও সরকারি ব্যয়ে পুঁজিপতিদের মাল বিক্রির বাজার কৃত্রিমভাবে তৈরি করে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। একে জনদরদ ভাবা, হয় প্রতারণা অথবা বোকামি।

৫ বছরের জন্য রেশনে চাল সরবরাহের যে কর্মসূচি তাতে প্রায় ১২ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হবে। অর্থাৎ উপভোক্তারা সামগ্রিকভাবে এই টাকাটা খাদ্যের জন্য খরচ না করে অন্যান্য জিনিস কেনায় খরচ করতে পারবে। ৫৩টি মন্ত্রকের অধীনে এ রকম ৩১০টি প্রকল্প চালানো হয়, যার মধ্য দিয়ে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে কিছু নগদ টাকা পৌঁছে যায়। একে ভিত্তি করে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার খানিকটা চাঙ্গা হয়। এ ভাবে সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে অর্থনীতির চাকা সচল রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্র-রাজ্যের সব সরকার। মৃতপ্রায় পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে এভাবে ঠেকনা দিয়ে কতদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে? দেউলিয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপরিকাঠামো সংসদীয় রাজনীতিও তাই আজ দেউলিয়া। তারই অনুষঙ্গ হিসাবে সুবিধা দিয়ে ভোট আদায়, টাকা দিয়ে ভোট কেনা—হয়ে উঠেছে সব শাসকের দস্তুর।

ভ্রম সংশোধন ঃ গণদাবী ৭৬ বর্ষ ১৫ সংখ্যায় পাঠকের মতামতে 'আজও স্বপ্ন দেখায় নভেম্বর বিপ্লব' লেখার প্রথম কলমের শেষ অনুচ্ছেদে ভুলক্রমে লেখা হয়েছে 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকল্প উন্নততর সমাজব্যবস্থার যে বুর্জোয়া দর্শন...'। সঠিকটি হবে—'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকল্প উন্নততর সমাজব্যবস্থার যে দর্শন...'। এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এস ইউ সি আই (সি)-র ক্যানিং সাংগঠনিক জেলার গোপালপুর হাটপুকুরিয়া লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড খোকন আখন্দ আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

কমরেড খোকন আখন্দ কৈশোরে ওই এলাকায় এসইউসিআই(সি)-র বিশিষ্ট জননেতা কমরেড সুজাউদ্দিন আখন্দ ও কমরেড আমিনউদ্দিন আখন্দের নেতৃত্বে গরিব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দলের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। এরপর কলকাতায় কলেজে পড়াকালীন তিনি এআইডিএসও-র সঙ্গে যুক্ত হন। পড়াশোনা শেষ হলে সরকারি চাকরির সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে তিনি ক্যানিংয়ে ফিরে যান। ঠিক সেই সময়েই কমরেড সুজাউদ্দিন আখন্দের শহিদ হওয়ার ঘটনা কমরেড খোকন আখন্দের মনে গভীর রেখাপাত করে।

তিনি গোপালপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পার্টির কাজকর্মে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করতে থাকেন। এই কাজ করতে গিয়ে বহু প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁকে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবী আদর্শে গড়ে ওঠা কমরেড খোকন আখন্দের চরিত্র সমস্ত প্রতিকূলতাকে ছাপিয়ে জায়গা করে নিয়েছিল মানুষের মনে। এলাকার গরিব মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ ছিল। গ্রামীণ চিকিৎসক হিসেবেও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অতি স্বল্পমূল্যে গরিব মানুষের চিকিৎসা করতেন তিনি এবং তার মধ্য দিয়েই বহু পরিবারে তিনি দলের চিন্তাধারা নিয়ে গেছেন।

কমরেড খোকন আখন্দ ২০১৮ সালে গোপালপুর হাটপুকুরিয়া লোকাল কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু সে দায়িত্ব পালন করেন। দলের বইপত্র, পত্র-পত্রিকা সহ শরৎ সাহিত্য ও অন্যান্য বই তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়তেন, অন্যদের পড়তে উৎসাহিত করতেন। এলাকায় সাংস্কৃতিক চর্চার পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও নাট্যদল গড়ে তুলেছিলেন। খেলাধূলার পরিবেশ গড়ে তুলতে শহিদ কমরেডের স্মরণে গড়ে তুলেছেন সুজা আখন্দ মেমোরিয়াল ক্লাব। এ ছাড়া স্থানীয় আমতলা মতিরাম হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সম্পাদক হিসাবে দীর্ঘদিন তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি জুনিয়র কমরেডদের নিয়মিত খোঁজখবর রাখা ও দলের চিন্তায় তাদের রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ অত্যন্ত যত্ন সহকারে করতেন। এলাকায় সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে লড়াই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন কমরেড খোকন আখন্দ। তিনি তাঁর গোটা পরিবারকে দলের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

১২ অক্টোবর এলাকায় কমরেড খোকন আখন্দ স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের কর্মী-সমর্থক-দরদি সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ চোখের জলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। সভায় বক্তব্য রাখেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ইয়াহিয়া আখন্দ। সভাপতিত্ব করেন ক্যানিং সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কমরেড বাদল সরদার। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত। কমরেড খোকন আখন্দের অকালপ্রয়াণে এলাকার গরিব মানুষ হারাল তাদের অত্যন্ত কাছের প্রিয় মানুষকে। দল হারাল আগামী দিনের একজন সম্ভাবনাময় নেতাকে।

কমরেড খোকন আখন্দ লাল সেলাম

কমরেড রবীন মণ্ডল শোষিত মানুষকে শ্রেণিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতেন

স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা, তিনবারের বিধায়ক, এস ইউ সি আই (সি)-র পূর্বতন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য কমরেড রবীন মণ্ডলের জীবনাবসান হয় গত ১ নভেম্বর। ২৫ নভেম্বর জয়নগরে শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জী স্মৃতি ময়দানে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা, দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণটি প্রকাশ করা হল।

অন্যান্য সময় নেতারা ঠিক করেন আমি কোন মিটিংয়ে বলতে যাব, কিন্তু এই মিটিংয়ের ক্ষেত্রে আমি নিজেই বলেছি, এই বীর বিপ্লবী যোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য আমি আসব।

প্রয়াত কমরেড রবীন মণ্ডলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার আমার কিছু সুযোগ ঘটেছিল। সে সম্পর্কে দু-একটি কথা বলব। আর এতক্ষণ ধরে বিভিন্ন বক্তার কাছ থেকে আপনারা তাঁর সংগ্রামের গৌরবময় অধ্যায়ের কিছু কিছু দিক শুনেছেন। একজন সাধারণ গ্রাম্য যুবক, মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে সংগ্রাম চালিয়ে কী অসাধারণ বিপ্লবী যোদ্ধায় পরিণত হতে পারেন, কমরেড রবীন মণ্ডল তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই জেলার এবং এই জয়নগর শহরের কিছু প্রাচীন ঐতিহ্য আছে যা এখনকার অনেকে জানেন না, অনেকের কাছে বিস্মৃতপ্রায়। জেলার এই শহরেই একদিন ভারতীয় নবজাগরণের মহান পথপ্রদর্শক বিদ্যাসাগরের অনুগামী শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী নবজাগরণের মশাল নিয়ে এসেছিলেন। এই শহরেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এখানকার যুবকদের কাছে সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে গিয়েছিলেন। এই শহরেই আরেক জন মহান বিপ্লবী যুবক কানাইলাল ভট্টাচার্য অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের মৃত্যুদণ্ড বিধান করে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছেন নিজের নাম গোপন করে আরেক জন বিপ্লবীকে বাঁচাবার জন্য। আবার এই জেলার এই শহরেই ভারতবর্ষের সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রতিষ্ঠিত হয় কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে। তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন কমরেড নীহার মুখার্জী ও এই শহরেরই আরেক জন বিপ্লবী কমরেড শচীন ব্যানার্জী। যিনি আবার কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীকেও এই সংগ্রামে সামিল করেছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন পার্টি গঠন করছেন, কলকাতায় তখন মুষ্টিমেয় কিছু কর্মী, ২০-২৫ জন। এখানেও কমরেড শচীন ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ওই সংখ্যক যুবক কাজ শুরু করেছেন। সেই সময় কমরেড শিবদাস ঘোষ শুনেছেন, সুন্দরবন জঙ্গলের প্রান্তে এবং দুরন্ত নদীর পাড়ে যে বিশাল সংখ্যক গরিব মানুষ বাঘের সাথে, সাপের সাথে লড়াই করে, জঙ্গল কেটে জমি আবাদ করেছে, সেই গরিব মানুষের উপর কী অমানুষিক অত্যাচার হচ্ছে। তেভাগার দাবি কংগ্রেস সরকার আইনগত ভাবে মেনে নিলেও এখানে অস্বীকার করছে জোতদাররা, মালিকরা। এখানকার গরিবদের রক্ত শুষে কলকাতায় তারা বিশাল অট্টালিকা বানিয়েছে, ফূর্তি করছে, ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত থাকছে। এখানকার গরিবদের কান্না, আর্তনাদ, হাহাকার কলকাতায় পৌঁছত না। এই এলাকাগুলো অনেকটা বিচ্ছিন্নই ছিল। এই সংবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষকে ব্যথিত করে, উদ্বেলিত করে। তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নেন, এদের ব্যথা-বেদনাকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলবেন। সেই আন্দোলন গড়ার ক্ষেত্রে কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে কমরেড ইয়াকুব পৈলান, কমরেড রেণুপদ হালদার এগিয়ে আসেন। তার পরে কমরেড রবীন মণ্ডল, আরও কিছুদিন পরে কমরেড আমির আলি হালদার এগিয়ে আসেন। এই নামগুলো হচ্ছে জেলা স্তরে। আর প্রত্যেকটি অঞ্চলে এরকম বহু নাম আছে, যাঁদের অনেককে আমি চিনি-জানি, তাঁদের সংগ্রাম দেখেছি। তাঁদের চরিত্র আমাকে মুগ্ধ করেছে, আমার মনে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করেছে।

কমরেড রবীন মণ্ডল সম্পর্কে আপনারা শুনেছেন, তিনি সচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন। সেই সময় কিছু পড়াশোনাও করেছিলেন। যখন তিনি চাকরি খুঁজছিলেন, এই সময় কীভাবে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল কমরেড ইয়াকুব পৈলানের সাথে, সেটাও আপনারা শুনেছেন। যখন কমরেড শচীন ব্যানার্জী তাঁর সাথে আলোচনা করেন, সেই আলোচনায় তিনি আকর্ষণ বোধ করেন। আবার মন দ্বিধাগ্রস্তও ছিল। একদিকে চাকরির আকর্ষণ, পরিবারকে দেখা, আর একদিকে কমরেড শচীন ব্যানার্জীর বক্তব্য। এরপরে যখন কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে, আপনারা শুনেছেন, ২০২১ সালে তিনি বলছেন, শিবদাস ঘোষের আবেদন তাঁর হৃদয়ে কী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সেই আলোড়নের প্রভাব তাঁর মধ্যে কীভাবে আবেগ সৃষ্টি করেছিল। সেটা শেষদিন পর্যন্ত তিনি বহন করেছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষকে শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করে এস ইউ সি আই (সি) পার্টি গড়ে তোলার আদর্শ নিয়ে এই জেলার শিক্ষাবঞ্চিত, নিরক্ষর, অজ্ঞ, গরিব ভাগচাষি-খেতমজুরদের মধ্যে তিনি কাজ শুরু করেন। এঁরা ছিলেন অত্যাচারিত, নিপীড়িত। কিন্তু তাঁদের জানা ছিল না কেন এই অত্যাচার, কেন এই নিপীড়ন। এ কি তাঁদের পূর্বজন্মের পাপের ফল? এ কি ভাগ্যের পরিহাস? এর থেকে মুক্তির কোনও পথ আছে কি? এই সময়েই কমরেড ইয়াকুব পৈলান, কমরেড রবীন মণ্ডল কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ নিয়ে ঘুরছেন, গ্রামে গ্রামে বৈঠক করছেন। তাঁরা এই অসহায় মানুষগুলোর, এই হতাশাচ্ছন্ন মানুষগুলোর ঘুম ভাঙান, তাঁদের সচেতন করেন, সজাগ করেন, সংঘবদ্ধ করেন। তাঁদের নিয়ে গড়ে তোলেন দুর্বার আন্দোলন। যে আন্দোলন রক্তাক্ত আন্দোলন, অনেকেই প্রাণ দিয়েছেন সেই আন্দোলনে। পুরুষেরা তীর-ধনুক নিয়ে জোতদারের লেঠেল বাহিনীর বিরুদ্ধে, পুলিশের বন্দুকের বিরুদ্ধে, মহিলারা দা-বঁটি নিয়ে গ্রামে গ্রামে লড়াই করেছেন। তাঁদের রক্ত ঝরেছে, বহু জন হতাহত হয়েছে, জেলে গেছে। এভাবে তেভাগার দাবি আদায় হয়েছে। এভাবে খাস জমি উদ্ধার হয়েছে। হাজার হাজার বিঘা জমি গরিবদের মধ্যে বন্টন হয়েছে। এরই ভিত্তিতে এসব অঞ্চলে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টির একটা দুর্ভেদ্য ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। এই ঘাঁটি ভাঙবার জন্য কংগ্রেস চেষ্টা করেছে। পরবর্তীকালে সিপিএম চেষ্টা করেছে। আমাদের বহু নেতাকে, কর্মীকে খুন করেছে। বলতে গেলে এমন কোনও গ্রাম নেই যেখানে আমাদের কোনও শহিদ বেদি নেই। অসংখ্য শহিদ বেদি, অনেকে প্রাণ দিয়ে গেছে এই পার্টিকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু মাথা নিচু করেনি।

এই সংগ্রামেরই বীর যোদ্ধা কমরেড রবীন মণ্ডল। দুর্বলতা বলতে কী বোঝায়, কাপুরুষতা বলতে কী বোঝায় তিনি জানতেন না। অত্যন্ত সাহসী ছিলেন, তেজস্বী ছিলেন। আমি নিজে দেখেছি তাঁকে। আমি তাঁর থেকে বয়সে ছোট। রাজনীতিতে হয়ত আমার থেকে একটু আগে বা একটু পরে এসেছেন, আমি ঠিক বলতে পারব না। ১৯৫১ সালে, আমার বয়স তখন খুবই কম, কমরেড নীহার মুখার্জী হঠাৎ আমাকে একটা চিঠি পাঠান— এখানে গিলের ছাটে একটা মিটিংয়ে যেতে হবে। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ জ্বর হওয়ায় তিনি শয্যাশায়ী। সেই সময় আর কাউকে তিনি পাননি পাঠাবার জন্য। তখন বক্তৃতা দেওয়ার কোনও ক্ষমতাই আমার ছিল না। আমাকে তিনি বললেন, তোমাকে যেতেই হবে। আমি ইতস্তত করছি, তিনি জোর দিয়ে বললেন। তারপর বললেন কী কী বলতে হবে। আমি কাগজে লিখে নিলাম। আজকের সভায় যদি গিলের ছাটের সেই সময়ের কেউ থাকেন, তাঁর হয়ত স্মরণে থাকতে পারে। আমি কোনও রকমে কিছু কথা বললাম। পরদিন আমি জটায় গেছি। সেখানে রবীন মণ্ডল ছিলেন। এই প্রথম তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ। জয়নগর অফিস থেকে চিঠি গেল আমার কাছে যে, গিলের ছাটের বক্তব্য একদম ভালো হয়নি। এরকম বক্তৃতা দিলে চলবে না। আমি রবীন মণ্ডলকে চিঠিটা দেখালাম। তিনি বললেন, আপনি কী বলেছিলেন? আমি দু-চার কথা বললাম। তিনি বললেন, এ রকম বক্তৃতা নয়— আজকের হাটে আমি বক্তৃতা দেব, আপনি শুনবেন, সেইভাবে বলবেন। তিনি দিনের বেলা হাটে বক্তৃতা দিতেন। দিনের বেলা কিন্তু পুলিশ তাঁকে ধরতে সাহস করত না। পুলিশ তাঁকে খুঁজত রাতে। সেই জটার গ্রামে আমি তখন ছিলাম। তিনদিন আমি ছিলাম, আমার আজও মনে পড়ে। রাতে মহিলারা পাহারা দিত। পুলিশ আসছে শুনলেই শাঁখ বাজাত, কাঁসর-ঘণ্টা বাজাত। রবীন মণ্ডল সরে যেতেন। আবার তিনি দিনের বেলা ঘুরতেন, বক্তৃতা দিতেন। কারণ দিনের বেলা ধরতে এলেই হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়ে যেত। তাঁর বক্তব্য শুনলাম। সেই সময় আরেকটি ঘটনা আমার কাছে শিক্ষণীয়। মহিলারা কাঁসর-ঘণ্টা বাজাচ্ছেন, পুলিশ আসছে। আমি যাঁর বাড়িতে ছিলাম, আমার তখন বয়স খুব কম, তিনি আমাকে সাহস দিয়ে বললেন, পুলিশ যদি এই বাড়িতে ঢোকে— আপনার নাম এই, ঠিকানা এই। আপনি বলবেন এটা আমার শ্বশুরবাড়ি, আপনি আমার জামাই। যদিও আমার পরিচয় দিতে হয়নি, পুলিশ সে বাড়িতে আসেনি। মানে একটা লড়াইয়ের ক্ষেত্র বলতে যা বোঝায়— একদিকে পুলিশ-জোতদারের লাঠিয়াল বাহিনী, আরেক দিকে জনগণ। দিনের বেলা রবীন মণ্ডল ঘুরছেন, রাতের বেলা কোথায় থাকেন পুলিশ খুঁজে পায় না। মহিলারা পাহারা দেয়। এই ছিল সেদিনকার সংগ্রাম। সমগ্র সুন্দরবন এলাকা জুড়েই ছিল এই লড়াইয়ের ক্ষেত্র, আজও আমার মনে দাগ কেটে আছে।

পরবর্তীকালে রায়দিঘিতে আমি বক্তা, তিনিও বক্তা। মিটিংয়ের পর রায়দিঘি অফিসে আমি বললাম, আপনার মনে আছে কিনা জানি না, জটাতে একদিন আপনি আমাকে শিখিয়েছিলেন কী করে বক্তৃতা দিতে হয়। তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, সেদিন আপনাকে আমি শিখিয়েছি, আজ আপনি আমাকে শেখাচ্ছেন। দুজনেই হাসলাম।

এই যে চরিত্র— সত্যিকারের জননেতা, জীবন্ত নেতা! এই জননেতা মানে— আপনারা তো আজ অনেক নেতা পান, টিভিতে, কাগজে ছবি বেরোয়। সবাই তো নেতা। কিন্তু মানুষ মন থেকে কাউকে নেয় না। রবীন মণ্ডলকে কোনও কাগজ নিয়ে যায়নি, টিভির তো প্রশ্নই ছিল না। রবীন মণ্ডল কেন, কমরেড শিবদাস ঘোষকেও নিয়ে যায়নি। কোনও কাগজ, কোনও টিভি, কোনও প্রচারযন্ত্র নিয়ে যায়নি। রবীন মণ্ডল ছিলেন জনগণের অন্তর থেকে গ্রহণ করা নেতা, যাঁকে তারা নিজের ঘরের বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের থেকেও আপন মনে করে। দরকার হলে সন্তানকে বলি দেবে, কিন্তু রবীন মণ্ডলকে রক্ষা করবে— এই মানসিকতা গড়ে উঠল এই চরিত্রকে দেখেই তো! এই চরিত্র কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় এক অসাধারণ সৃষ্টি। এটা আপনাদের বুঝতে হবে।

স্মরণসভা, মাল্যদান, বক্তৃতা দেওয়া, কিছু কথা বলা— এগুলোর কোনও মানে নেই, যদি বক্তা হিসাবে আমরা, যাঁরা মাল্যদান করলাম, যাঁরা শ্রোতা, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন, তাঁরা যদি মনে না করেন এই চরিত্র থেকে আমার শেখার কী আছে। আজকে স্মরণসভা হবে— এই জন্যই কি তিনি দলে যুক্ত হয়েছিলেন? নাম-যশ-পদের কোনও প্রলোভনে তিনি কি যুক্ত হয়েছিলেন? তিনি যুক্ত হয়েছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং অত্যাচারিত গরিব মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসায়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

কলকাতায় বিশাল যৌথ সমাবেশে কৃষক-শ্রমিকের যুক্ত আন্দোলনের ডাক

চাষির ফসলের এমএসপি আইনসঙ্গত করা, কালোবাজারি বন্ধকরে সস্তায় সার-বীজ-কীটনাশক ও সেচের ব্যবস্থা করা, খাদ্যশস্যের সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা, গ্রামীণ শ্রমিকদের সারা বছর কাজ ও বাঁচার মতো মজুরি দেওয়া, কৃষকদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা, শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার হরণকারী চারটি কালা শ্রমকোড বাতিল করা ইত্যাদি একগুচ্ছ দাবিতে সংযুক্ত কিসান মোর্চা (এসকেএম) ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ উদ্যোগে দেশের সমস্ত রাজধানী শহরে রাজ্যপাল ভবনের সামনে বিক্ষোভ, অবস্থান, ধরনা সহ নানা কর্মসূচি পালিত হল। গোটা দেশের কয়েক লক্ষ শ্রমিক ও কৃষক এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

কলকাতায় রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে ২৬ -২৭ নভেম্বর অবস্থান কর্মসূচির পর ২৮ নভেম্বর বিশাল সমাবেশ হয়। বক্তব্য রাখেন কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনগুলির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। এস কে এম-এর কেন্দ্রীয় নেতা ও অল ইন্ডিয়া কিসান-খেতমজদুর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বলেন (উপরের ছবি), শ্রমিক-কৃষকের এই সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ হল আন্দোলনের মঞ্চ, নির্বাচনী মঞ্চ নয়। ভারতের গণআন্দোলনের ইতিহাসে শ্রমিক ও কৃষককে নিয়ে গড়ে ওঠা এই যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। নিপীড়িত জনগণের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাস্তব পরিস্থিতিই আজ আমাদের এক মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দিল্লির কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে ৫০০ কৃষক সংগঠনের মিলিত সংগঠন 'সংযুক্ত কিসান মোর্চা'। এই আন্দোলন আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তন করে কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষিত হয় না, একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী সংগঠিত গণআন্দোলনের পথেই পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে রচিত শ্রমিক-কৃষক বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করতে সরকারকে বাধ্য করা যায়। তাই চাই কৃষক-শ্রমিকের যুক্ত আন্দোলন।

রাশিয়ায় মহান লেনিনের নেতৃত্বে ও চিনে মহান মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই লক্ষ্যেই আমাদের কৃষক-শ্রমিকদের এই সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ আন্দোলন পরিচালনা করবে, এটাই ইতিহাসের দাবি। তিনদিনের এই কর্মসূচিতে আরও বক্তব্য রাখেন এ আই কে কে এম এস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রঙ্গলাল কুমার ও কমরেড স্বপন দেবনাথ সহ সংগ্রামী শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃবৃন্দ।

ওড়িশা রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ

সরকার-নির্ধারিত মজুরির দাবি

বিড়ি শ্রমিকদের বিক্ষোভ পূর্ব মেদিনীপুরে

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সংগ্রামী বিড়ি শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃত্বে পাঁচ শতাধিক শ্রমিক ২৯ নভেম্বর জেলাশাসক ও ডেপুটি লেবার কমিশনারের কাছে বিক্ষোভ দেখান। অবিলম্বে সরকার নির্ধারিত মজুরি, বোনাস ও পেনশন চালু, বিড়ি শ্রমিকদের সরকারি পরিচয়পত্র প্রদান, বিড়ি শিল্প থেকে আদায় করা জিএসটির ৫০ শতাংশ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে খরচ করা ইত্যাদি দাবিতে কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি দেন।

কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন এ আই ইউ টি ইউ সি জেলা সম্পাদক কমরেড মধুসূদন বেরা, সংগ্রামী বিড়ি শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক ও সভাপতি যথাক্রমে চন্দ্রমোহন মানিক ও অজিত ভূঁইয়া।

বিক্ষোভে পুলিশের হামলা

একের পাতার পর

কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৫ ডিসেম্বর রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, জনজীবনের সংকট নিয়ে ভোটবাজ দলগুলির কোনও মাথাব্যথা নেই। তারা সংকীর্ণ নির্বাচনী স্বার্থে একে অপরের বিরুদ্ধে গরম গরম স্লোগান দেয়। ক্ষমতাসীনরা সরকারি এজেন্সিকে বিরোধীদের শায়েস্তা করার কাজে লাগায়। দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে দল বদলে শাসকদলে নাম লেখানোর হিড়িক পড়ে যায়। আসলে বুর্জোয়া ব্যবস্থার কল্যাণে সমস্ত ভোটবাজ দলই আজ দুর্নীতিগ্রস্ত, তাই এরা কেউই দুর্নীতির উচ্ছেদ করতে পারে না। এর বিপরীতে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি) সংগ্রামী বামপন্থার লাইনে আন্দোলন করে চলেছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন গড়ে তুলছে। তিনি আগামী আন্দোলনের কর্মসূচিগুলি ঘোষণা করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত ও প্রাক্তন সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল।

মহিলাকর্মীর পোশাক ছিঁড়ে দেয় পুলিশ। কর্মীরা ব্যানারের আড়াল দিয়ে তাঁকে বের করে আনেন

লাথি মেরে, টেনে-হিঁচড়ে গ্রেফতার করছে পুলিশ

অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের ডিএ বৃদ্ধির দাবি

হাইকোর্ট ডিএ-কে কর্মচারীদের অধিকার বললেও মুখ্যমন্ত্রী তাকে দয়ার দান বলেছেন। এ দিকে মূল্যবৃদ্ধির চাপে অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবন দুর্বিষহ। কারণ ডিএ না বাড়লে তাঁরা বাড়তি টাকা পান না। তাঁদের নেই পেনশনের বার্ষিক বৃদ্ধি, বাড়িভাড়া ভাতা কিংবা চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি। মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য আবার সংশোধিত বিল পাশ করানো হলেও অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকরা সেই তিমিরেই। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করার পাশাপাশি অবিলম্বে ডিএ বৃদ্ধি ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কার্তিক সাহা।

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও শিক্ষক

লেনিন মৃত্যুশতবর্ষে

সমাবেশ

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

বক্তা ঃ কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

কমরেড জয়সন যোসেফ

শহিদ মিনার ময়দান

২১ জানুয়ারি বেলা ১টা

সাভারকরের ক্ষমাভিক্ষা এবং ব্রিটিশকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি

দেশজোড়া উগ্র হিন্দুত্ববাদ সভ্যতার অগ্রগতি, শোষিত মানুষের মুক্তির পথে এক গুরুতর বাধা হিসাবে দেখা দিয়েছে। ধর্মান্ধতা ছড়িয়ে ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করে তাদের বাঁচার দাবিগুলিকে পিছনে ঠেলে দিচ্ছে বিজেপি। পুঁজিপতিদের স্বার্থকে দেশের স্বার্থ বলে প্রতিপন্ন করছে এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থে কাজ করাকেই দেশপ্রেম বলে জাহির করছে। বাস্তবে বিজেপি কতবড় দেশপ্রেমিক তা তাদের অনুসৃত হিন্দুত্ববাদের উদগাতা সাভারকরের দেশপ্রেমের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

১৯১১ সালের জুন মাসে সাভারকর আন্দামানের সেলুলার জেলে এসে পৌঁছন। বছর ঘোরবার আগেই তিনি ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি ‘ক্ষমাভিক্ষার আবেদন’ জমা দেন। এরপর যথাক্রমে ১৯১৩, ১৯১৪, ১৯১৮ এবং ১৯২০ সালে একের পর আবেদনপত্র জমা দেন। প্রথম আবেদনপত্রটির বিষয়টি পাওয়া যায়নি। সাভারকর তাঁর পাঠানো ১৪ নভেম্বর, ১৯১৩ সালের পরবর্তী আবেদনপত্রে এই প্রথম আবেদনটির উল্লেখ করেন। আবেদনপত্রের শেষ এবং প্রকাশিত অনুচ্ছেদটি নিচে দেওয়া হল।

‘...পরিশেষে ক্ষমাভিক্ষার আবেদনটি অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে পাঠ করার সময় মহামান্য হুজুরকে আমি এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি কি যে, অনুমোদনের জন্য এটিকে ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হবে? ভারতীয় রাজনীতির বর্তমান অগ্রগতি এবং সরকারের সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি আরও একবার সাংবিধানিক পথটিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ১৯০৬-১৯০৭ সালের ভারতবর্ষের উত্তেজনাময় এবং আশাহীন পরিস্থিতিতে যে ভাবে শান্তি ও অগ্রগতির পথ আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল আজ সেই রকম কণ্টকময় পথে ভারতবর্ষ ও মানবতার কল্যাণকামী কোনও মানুষ অন্ধের মতো পা ফেলবে না।

কাজেই সরকার যদি তাঁদের বহুমুখী দয়ার দানে আমাকে একটু মুক্ত করে দেন তবে আমি আর কিছু পারি বা না পারি চিরদিন সাংবিধানিক প্রগতি এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের অবিচলিত প্রচারক হয়ে থাকব। যত দিন আমরা জেলে থাকব, তত দিন ভারতে মহামান্য হুজুরের শতসহস্র অনুগত প্রজার গৃহে প্রকৃত সুখ আর আনন্দ থাকতে পারে না। রক্ত জলের চেয়েও গাঢ়। কিন্তু আমরা যদি মুক্তি পাই তা হলে জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দধ্বনি তুলবে, এই সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে যে, সরকার কেমন করে প্রতিহিংসা নিতে হয় এবং শাস্তি দিতে হয় এ কথার চেয়ে কেমন করে ক্ষমা করতে হয়, সংশোধন করতে হয় এ কথা আরও বেশি ভাল করে জানে।

উপরন্তু দেশে ও বিদেশে অনেক বিপথগামী যুবক, যারা একসময় পথপ্রদর্শক হিসেবে আমার দিকেই তাকিয়ে থাকত, আমার সাংবিধানিক পথে ফিরে আসা তাদের শান্তির পথে ফিরিয়ে আনবে। সরকার আমাকে যে কাজ করতে বলবে সেই মতোই প্রায় সব করতে আমি প্রস্তুত। কেন না আমার আজকের পরিবর্তন যেহেতু বিবেকের দ্বারা পরিচালিত, তাই আমার ভবিষ্যতের আচরণও সেই রকমই হবে। অন্য ভাবে যা পাওয়া যেতে পারে সে তুলনায় আমাকে জেলে আটকে রাখলে কিছুই পাওয়া যাবে না। শক্তিশালীর পক্ষেই একমাত্র ক্ষমাশীল হওয়া সম্ভব। কাজেই অনুতপ্ত সন্তান পিতৃতুল্য সরকারের দরজায় ছাড়া আর কোথায় ফিরে যাবে? মহামান্য হুজুর অনুগ্রহ করে বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন এই আশা রইল।’

সাভারকরের আবেদন মঞ্জুর করে কয়েকটি শর্তে তাঁকে মুক্তি দেয় ব্রিটিশ সরকার। এর মধ্যে একটি শর্ত ছিল যে, সরকারের অনুমতি ছাড়া সাভারকর প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনওরকম রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগ দিতে পারবেন না।

কারামুক্তির সময়ে কৃতজ্ঞ, বিজেপি-কথিত ‘বীর’ সাভারকর জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের উদ্দেশে নিচের বয়ানটি জমা দেন ঃ

‘আমি এই মর্মে স্বীকার করছি যে, আমার বিচার ছিল সঠিক এবং শাস্তিও ছিল যথাযথ। আমি অতীতে যে হিংসার পথ গ্রহণ করেছিলাম, সেটি আন্তরিকভাবে ঘৃণায় পরিহার করছি এবং সর্বশক্তিতে আইন এবং সংবিধানকে সমর্থন করার কর্তব্যের দায়বদ্ধতা আমি অনুভব করছি এবং ভবিষ্যতে আমাকে যতদূর অনুমতি দেওয়া হবে ততদূর পর্যন্ত সংস্কারকে সফল করে তুলতে আমি ইচ্ছুক।’

(ফ্রন্টলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত দলিল, ৭ এপ্রিল, ১৯৯৫)

লেনিন মৃত্যুশতবার্ষিকী উদযাপন

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও শিক্ষক কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে অসংখ্য আলোচনাসভা ও ‘লেনিন শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি’ গঠিত হচ্ছে। সর্বত্রই বহু বামমনস্ক মানুষ সভাগুলিতে যোগ দিচ্ছেন।

১৮ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়ায় এ বিষয়ে আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ পরিমল হালদার। প্রধান আলোচক ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ। সভা সঞ্চালনা করেন কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক সুশান্ত চক্রবর্তী। ডাঃ পরিমল হালদারকে সভাপতি ও সুশান্ত চক্রবর্তীকে সম্পাদক করে এলাকার বিশিষ্টজনদের নিয়ে ‘লেনিন প্রয়াণ শতবর্ষ উদযাপন কমিটি’ গঠিত হয়।

পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় ২ ডিসেম্বর এক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনুরূপা দাস। শেষে সমরেন্দ্রনাথ মাজিকে সভাপতি ও দীপঙ্কর মাইতিকে সম্পাদক করে আঞ্চলিক ‘লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপন কমিটি’ গঠিত হয়।

বিধাননগরে ৩ ডিসেম্বর এক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন দলের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী। সভা শেষে বলাইচন্দ্র মোদককে সভাপতি ও তপন ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে ‘লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপন কমিটি’ গঠিত হয়।

দিল্লিতে এআইডিএসও-র আলোচনাসভা

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও শিক্ষক কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষে এআইডিএসও-র দিল্লি ইউনিট ২৬ নভেম্বর একটি আলোচনাসভার আয়োজন করে। দিল্লির নানা স্কুল-কলেজ ও এলাকার ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশ নেন। ‘নভেম্বর বিপ্লব ও লেনিন’ শীর্ষক এই আলোচনায় বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ কমরেড দীনেশ মহন্ত। সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের দিল্লি ইউনিটের সম্পাদক কমরেড শ্রেয়া।

এম আর পি-তে সারের দাবিতে রায়গঞ্জে অবরোধ কৃষকদের

এই সময়টা গম, ভুট্টা, আলু, সর্ষে, সব্জি চাষের মরশুম। এই সব চাষে প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার। বাড়তি চাহিদার সুযোগে উত্তর দিনাজপুরে সার ব্যবসায়ীরা অবাধে কালোবাজারি চালাচ্ছে, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চড়া দামে সার বিক্রি করছে। সরকার

দেখেও দেখে না। কর্মী কম থাকার অজুহাতে কৃষি আধিকারিকরা প্রয়োজনীয় নজরদারিটুকুও করছেন না। কৃষকরা সারের দোকানে এমআরপি দামে সার চাইলে তাদের অন্য জায়গায় যেতে বলা হচ্ছে। মারধরের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কৃষকরা গ্রামে গ্রামে আন্দোলনের কমিটি গড়ে তুলে সংগঠিত হতে শুরু করেছেন। এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে সারের কালোবাজারি বন্ধে ডিডিএ, এডিএ-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাতেও কাজ না হওয়ায় ২৪ নভেম্বর রায়গঞ্জ মহারাজা মোড়ে তাঁরা রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। ৬ ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলার পর জেলা, মহকুমা ও ব্লক কৃষি আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে এমআরপি দামে সার দেওয়ার ও কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁরা মাইকে ঘোষণা করেন, কয়েকজন অসাধু সার ব্যবসায়ীর লাইসেন্স বাতিল হয়েছে এবং কয়েকজনকে শো-কজ করা হয়েছে। এরপর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রির নিয়ম সহজ-সরল করা এবং ধলতা নেওয়া বন্ধের দাবিতে খাদ্য দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পরদিন থেকেই কৃষকরা এমআরপি দামে সার পেতে থাকেন। কোনও দোকানদার ওই দামে সার দিতে অস্বীকার করলে সেখানে এআইকেকেএমএস-এর ব্যানার নিয়ে গ্রাম কমিটি উপস্থিত হলেই তারা এমআরপি-তে সার দিয়ে দিচ্ছে।

এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন রায়গঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক রুবিনা চৌধুরী, সংগঠনের জেলা সভাপতি নবীন সিংহ, জেলা কমিটির সদস্য দিলীপ দেবনাথ এবং সংগঠনের জেলা সম্পাদক দয়াল সিংহ।

এআইডিওয়াইও-র আসন্ন যুব উৎসবের প্রচার

বার্ধক্যেও রবীন মণ্ডলের জ্ঞানের স্পৃহা ছিল প্রবল

তিনের পাতার পর

আপনাদের আরেকটি ঘটনা বলি। ১৯৬৭ সালে যখন তাঁকে এমএলএ নির্বাচনে দাঁড়াবার কথা কমরেড শচীন ব্যানার্জী বলেন, তিনি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। বলছেন, আমি এখান থেকে যাব না। এখানে গরিবদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। ঘরে ঘরে কান্না। আমি বিধানসভায় চলে গেলে এদের দেখবে কে? তখন কমরেড শচীন ব্যানার্জী তাঁকে কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে নিয়ে যান। কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁকে বোঝান, বিধানসভায় আপনি গেলে এখানকার গরিবদের উপর কী অত্যাচার হচ্ছে, সেটা আপনি বলতে পারবেন, প্রতিবাদ করতে পারবেন। এটা একটা সুযোগ। তখন বলেন, আমার একটা শর্ত আছে। শর্ত হচ্ছে, যখনই ওখানকার গরিবদের ডাক আসবে, আন্দোলন-লড়াইয়ের প্রয়োজন আসবে, বিধানসভার অধিবেশন থাকলেও আমি বিধানসভায় যাব না। এই শর্তে তিনি রাজি হয়েছিলেন। এমএলএ হওয়ার মোহ তো আজ কত, এই দলে সেই দলে, খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে যায়! আর দেখুন কমরেড রবীন মণ্ডলকে। কমরেড রবীন মণ্ডলকে খুন করার ষড়যন্ত্র বহুবার হয়েছিল। জটার থেকে দূরে কোনও গ্রামে যাবেন তিনি, সেখানকার গরিবরা ডেকেছে। পথে বিপদ— জোতদার বাহিনী। তাঁকে অন্যরা বলছে, আপনি যাবেন না, আপনাকে খুন করবে। তাঁর উত্তর ছিল— 'মানুষ তো একবারই মরে। কুকুর-বেড়ালের মতো মরব না, মানুষের মতো মরব। শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে বীরের মতো মরব।' আমার নিজের কানে শোনা। কী অসাধারণ চরিত্র! জোতদাররা একদিকে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে, আর এক দিকে বহু প্রলোভন দিয়ে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হত্যার ষড়যন্ত্র, নানা প্রলোভন কোনও কিছুই তাঁকে টলাতে পারেনি।

বক্তা হিসাবে আমি তাঁকে দেখেছি। অনেক বক্তাকেই আমি দেখেছি। তাঁদের বক্তব্যের গুরুত্ব থাকে নানা দিক থেকে। জ্বালাময়ী ভাষণ থাকে, মানুষের মধ্যে আবেগ সৃষ্টি হয়। রবীন মণ্ডলের বক্তব্যের মধ্যে রাজনৈতিক শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় থাকত। শুধু আবেগময় ভাষা নয়, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য নয়। মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি যাকে বলে, সেই শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরতেন, শ্রোতাদের শ্রেণিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তুলতেন। এটাও কিন্তু আরেকটা বিরল দৃষ্টান্ত, আমার নিজের চোখে দেখা।

আরেকটা জিনিসও আমি লক্ষ করেছি। এই জেলার নেতাদের মধ্যে কমরেড ইয়াকুব পৈলান, কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারকে বাদ দিলে কমরেড রবীন মণ্ডল, কমরেড রেণুপদ হালদার, কমরেড আমীর আলি হালদার সহ সব নেতারা, এমনকি আঞ্চলিক নেতারা সবাই বিবাহিত ছিলেন, তাদের সন্তানও ছিল, কিন্তু কোনও সময় লড়াই করতে গিয়ে, পুলিশ-গুণ্ডাদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে গিয়ে, জেল হাজতে বন্দি হতে গিয়ে একবারও ভাবেননি— স্ত্রী-সন্তানকে দেখবে কে, বলা তো দূরের কথা। এভাবেই তাঁরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে বুকে বহন করেছিলেন।

তিনি বহুদিন ধরে রোগগ্রস্ত। আগের মতো ঘুরতে পারতেন না। কাজ করতে পারতেন না। কিন্তু তিনি দলের সমস্ত খোঁজখবর রাখতেন। আরেকটা জিনিসও আমি দেখেছি। অনেকেই মিটিং মিছিল সংগঠনের কাজে ব্যস্ত থাকে। তারা বলে আমরা পড়ার সময় পাই না। কখন পড়ব! কমরেড রবীন মণ্ডল কিন্তু, এত আন্দোলন, মিছিল-মিটিং, দিনরাত ছুটছেন, সাথে থাকত পার্টির বইপত্র, কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য, পার্টির কাগজপত্র। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। দলের সর্বশেষ যে পুস্তক বেরিয়েছে এবং মুখপত্র গণদাবী বেরিয়েছে, যখন চোখ অন্ধ, তখনও তিনি অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শুনতেন। আমার সাথে যখন মাঝেসাঝে কোনও মিটিংয়ে দেখা হত, অসুস্থ শরীর, অন্যেরা ধরে নিয়ে আসত, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতেন— কমরেড, এই বক্তব্যটা কেন লেখা হল, এ ভাবে কেন লেখা হল? আমি কমরেড পৈলান সাহেব, কমরেড আমির আলি হালদার ছাড়া আর কারও মধ্যে এতটা রাজনীতি বোঝার আগ্রহ দেখিনি। আমার এখনও মনে পড়ে, গত পার্লামেন্ট ইলেকশনে যখন আমরা হেরে যাই, কৃষ্ণচন্দ্রপুরে একটা বিশাল সভা হয়েছিল। কমরেড রবীন মণ্ডল মঞ্চে ছিলেন। বক্তব্য শেষ হওয়ার পর— চোখে দেখেন না— আমার খোঁজ করছেন। আমাকে ডাকলেন। আমি কাছে গেলাম। আমাকে বললেন, আচ্ছা কমরেড, 'কর্পোরেট'টা কী? গণদাবীতে লেখা হয়, নতুন শব্দ শুনে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন। আমি বললাম, একচেটিয়া পুঁজিবাদী সংস্থা বা কোম্পানিকেই কর্পোরেট বলে। এইরকম ছিল তাঁর জ্ঞানের স্পৃহা, জানবার আকুতি। এখন এগুলো খুব দুর্লভ। আমাদের অনেক কর্মী, অনেক নেতা বলেন, কাজের চাপে সময় পাই না। আমি তাঁদের এই শিক্ষা নিতে বলি। এমনকি যখন পড়তে পারছেন না, তখনও কাউকে পেলে, কোনও কর্মীকে বা এলাকার কোনও যুবককে পেলে ডেকে বলতেন, তুমি একটু পড়ে শোনাও। এইভাবে তিনি রাজনৈতিক বক্তব্যের সাথে পরিচিত থাকতেন।

অনেকের বার্ধক্যে অবসন্নতা আসে। বার্ধক্যে শরীর যেমন নিস্তেজ হয়, দুর্বল হয়, জরাগ্রস্ততা আসে— মানসিক জরাগ্রস্ততাও আসে। একসময় যাঁরা অনেক লড়াই করেছিলেন, শেষ জীবনে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিপ্লবী ঐতিহ্য আগের মতো রক্ষা করতে পারেন না। এখানে কমরেড রবীন মণ্ডল এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। শরীর অসুস্থ, শয্যাশায়ী, দৃষ্টিহীন, চলৎশক্তিহীন, ৯৪ বছরের বৃদ্ধ— কিন্তু মন তাঁর সতেজ। মানসিক যৌবন চিন্তার যৌবনকে রক্ষা করে গেছে। মনেপ্রাণে চাইছেন, এই পার্টি শক্তিশালী হোক, পার্টির বিস্তার ঘটুক। পার্টির বিস্তার হচ্ছে, আন্দোলন-লড়াই হচ্ছে, কর্মীরা গুলির মুখে দাঁড়াচ্ছেন— তাঁর আনন্দ কী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, সেটা আপনারা শুনেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পৌঁছচ্ছে— লিখছেন, এর আনন্দই আলাদা। এ সবের খোঁজখবর রাখতেন। কাকদ্বীপের সাংগঠনিক সম্পাদক কমরেড সুজিত পাত্র পরশুদিন আমাকে ফোনে বলেছিল, তার সাথে ওঁর কিছু কথা একসময় হয়েছিল। ও-দিকে একসময় সংগঠন খুব জোরদার ছিল। এখন খানিকটা দুর্বল। অনেক নেতাই মারা গেছেন, অনেক নেতা খুন হয়ে গেছেন, নতুন নেতা এখনও গড়ে ওঠেনি। কমরেড সুজিতকে বলা তাঁর একটা কথা আমার খুবই স্ট্রাইক করেছে। তার তাৎপর্য ও বুঝেছে কি না, আমি জানি না। বলেছেন— আগুন জ্বালিয়ে রাখো। আগুন এখন একটু কমতেও পারে, কিন্তু আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখলে আগুন আবার বড় হয়ে জ্বলে উঠবে। অর্থাৎ, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখো। এখন লোকজন একটু কম হলেও, সংগঠন খানিকটা দুর্বল হলেও কাজ চালিয়ে যাও, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আগুনকে জ্বালিয়ে রাখো। এই আগুন আবারও জ্বলে উঠবে। আগুন জ্বলে উঠছে। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, পার্টির শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। এই তো ৫ আগস্ট কলকাতায় কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবার্ষিকীর ঐতিহাসিক সমাবেশ আপনারা দেখেছেন। আমাদের এমএলএ নেই, এমপি নেই। কাগজে আমাদের প্রচার নেই, টিভিতে প্রচার নেই। আমাদের কর্মীরাই প্রচারক। কিন্তু ভারতের ২৬টি রাজ্যে আজ আমরা কাজ করছি। শিবদাস ঘোষের শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ছে। যেখানে আমাদের কমরেডরা শিবদাস ঘোষের শিক্ষা বহন করে নিয়ে যেতে পারছেন, সেখানেই অসংখ্য সৎ মানুষ, চিন্তাশীল মানুষ, সৎ শ্রমিক-কৃষক আকৃষ্ট হচ্ছে, সাড়া দিচ্ছে। এই যে কলকাতায় সমাবেশ হল, এর অর্থ কে সংগ্রহ করেছে? কর্মীরা। কে দিয়েছে? জনগণ। আপনারা যারা সমাবেশে গেছেন, নিজেরাই চাঁদা দিয়ে বাস ভাড়া করে গেছেন। আবার বাস ভাড়া করে ফিরেও এসেছেন। কত লোক দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে। ওড়িশা থেকে চাঁদা তুলে দুটো ট্রেন ভাড়া করে এসেছে। বিহার থেকে এসেছে। সুদূর দক্ষিণ ভারতের, উত্তর ভারতের সব রাজ্য থেকেই এসেছে। পূর্ব ভারত থেকেও এসেছে। দেখেছেন কী ভাবে সমাবেশে মানুষ কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা সম্পর্কে বক্তব্য শুনেছে। নিঃশব্দে, নীরবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ। এমনকি যারা বাংলা জানেন না, বোঝেন না— কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ— নানা রাজ্য থেকে এসেছেন, তাঁরাও নিঃশব্দে শুনেছেন শিবদাস ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধাবশত। নড়াচড়া নেই। এই হচ্ছে দলের আসল শক্তি।

আপনারা জানেন, প্রথম দিকে কংগ্রেস, তারপর ৩৪ বছর ধরে সিপিএম তাদের রাজত্বে পশ্চিমবাংলায় কী ভাবে এস ইউ সি আই (সি)-কে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান চালিয়েছিল। এই জেলায় আমাদের কত নেতা-কর্মীকে তারা খুন করেছে, আপনারা জানেন। আজ সেই সিপিএমের অবস্থা কী? ৩৪ বছর যারা রাজত্ব করেছে, আজ কংগ্রেস, নওশাদ সিদ্দিকি বলে একজন পীরকে ধরে সেই সিপিএম মাথা তোলার চেষ্টা করছে। গত লোকসভা ভোটে এই সিপিএমই বলেছে, আগে রাম, পরে বাম। এখন বিজেপিকে ভোট দাও, তার পর আমরা আসব। এই রাজনীতির চর্চা করছে। এইভাবে দলকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই কর্মীদের তুলতে পারছে না। কর্মীরা এখনও আধশোয়া অবস্থায়। আবার সিপিএম একটু উঠবে, যদি সরকার পায়, মন্ত্রীত্ব পায়। ওদের শক্তি মন্ত্রীত্ব, এমএলএ-এমপি আর টাকা। টাকা দিয়ে মানুষকে কিনবে। সমস্ত দলই তাই করে— তৃণমূলও তাই। এই যে তৃণমূলের এত দুর্নীতি, এত টাকা কোথায় যায়! পাবলিকের এই টাকা আত্মসাৎ করে শহরে শহরে বিশাল রাজকীয় অট্টালিকা বানায়, ব্যবসায় খাটায়, ব্যাঙ্কে জমায় আর ভোগবিলাসে মত্ত থাকে। পঞ্চায়েত চাই, জেলা পরিষদ চাই। আর অন্যদিকে ভোটের সময় টাকা ঢালবে। এখন ভোট মানেই তো টাকার খেলা! গোটা ভারতেই তাই। আপনারা কাগজে দেখবেন— এই যে চারটে বিধানসভা নির্বাচন, আজ নির্বাচনের শেষ দিন। এরপর পার্লামেন্ট আসবে। কংগ্রেস আর বিজেপির লড়াই হবে। অন্যান্য দলও নামবে। এই যে ভোটে হাজার হাজার কোটি টাকা ছড়াবে, এ টাকা কার টাকা? এই যে বার্ধক্য ভাতা, মহিলা ভাতা, অমুক ভাতা, তমুক ভাতা— এ টাকা কার? এ হচ্ছে সরকারি তহবিলের টাকা। যে টাকা স্বাস্থ্যখাতে, শিক্ষাখাতে দেওয়ার কথা, যে টাকা দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার কথা, খরা নিয়ন্ত্রণ করার কথা, চাষির কৃষিঋণ মকুব করার কথা— এসব ক্ষেত্রে সাহায্য করার কথা, সেই টাকাটা সেখানে ব্যয় না করে ভোটের আগে এই ভাবে কিছু ঘুষ দেয়। মানুষকে ভিখারি বানিয়ে, ভিখারির মন তৈরি করে, তারপর ভিক্ষা দেয়। ভোটের জন্য ভিক্ষা দেওয়া। তার ফলে আবার সরকারি আর্থিক ভাণ্ডার কমছে। আর সরকারি ভাণ্ডার কমছে মানে বাজেট ঘাটতি। ঘাটতি বাজেট পূরণ করার জন্য ট্যাক্স বৃদ্ধি করে আবার জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে। এই যে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে, এটা ঘটছে কেন? প্রতিটি জিনিসের উপর প্রচুর ট্যাক্স। ট্যাক্সের উপরে ট্যাক্স, তার উপরে ট্যাক্স। বিদেশ থেকে অল্প দামে পেট্রল-ডিজেল কেনে। এখানে বেশি দামে বিক্রি করে। সে টাকা সরকার নেয়। এর ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। এসবই চলছে মানুষকে প্রতারণার দ্বারা।

দেশের আজ ভয়ঙ্কর দুর্দিন। আমি অল্প কথায় কিছু বলতে চাই। এই রকম দুর্দিন আগে কখনও আসেনি। কোটি কোটি বেকার। ঘরে ঘরে বেকার। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, এমএ-এমএসসি পাশ করেছে, চাকরি নেই। রিক্সা চালায়, ভ্যান চালায়। পিয়নের চাকরি খোঁজে। দশটা পোস্ট খালি থাকলে তার জন্য এক লক্ষ যুবক অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এরা বিএ-এমএ পাশ করা ছেলে। ডিগ্রির কোনও মূল্য নেই। আমি তো শুনি, এখন গ্রামাঞ্চলের ছেলেরা পড়তেও চাইছে না। কিছু মেয়ে স্কুলে পড়তে যায়, ছেলেদের সংখ্যা কমে গেছে। কোথাও কাজের সন্ধান পেলে, কেরালা হোক, কর্ণাটক হোক, এমনকি দুবাই হোক— যেখানে হোক চলে যায়। এদের বলে মাইগ্র্যান্ট লেবার। ভবঘুরের মতো আর কী। এখানে কয়েকদিন, ওখানে কয়েকদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দেখুন, সুড়ঙ্গ করতে গেছে হিমালয় পর্বত খুঁড়ে, তার মধ্যে আটকে গেছে ৪১ জন শ্রমিক। এর মধ্যে এ রাজ্যের শ্রমিকও আছে, অন্য রাজ্যের শ্রমিকও আছে। এই যে কিছুদিন আগে কাতারে ফুটবল খেলা হয়ে গেল, তার স্টেডিয়াম তৈরি করতে গিয়ে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে প্রচুর গরিব মানুষ গেছে। স্টেডিয়াম তৈরি করতে গিয়ে কয়েক হাজার শ্রমিক মারা গেল। বিশাল বিশাল অট্টালিকা তৈরি করতে গিয়ে মারা যায়।

আটের পাতায় দেখুন

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (৭)

শুধু দখল নয়, শ্রমিক শ্রেণিকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে

ভি আই লেনিন

এ বছরটি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ। এই উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে ভি আই লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ সংক্রান্ত যে কোনও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এ বার সপ্তম কিস্তি।

১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা ঃ মার্কসের বিশ্লেষণ

১। কমিউনার্ডদের* বীরত্বের উৎস কোথায় নিহিত?

এটা সকলেরই জানা যে, ১৮৭০ সালের শরৎকালে, কমিউনের কয়েক মাস আগে,প্যারিসের শ্রমিকদের সতর্ক করে মার্ক্স বলেছিলেন, সরকারকে উৎখাত করার যে কোনও প্রচেষ্টা অপরিণামদর্শী নির্বোধের মতো কাজ হবে। কিন্তু ১৮৭১ সালের মার্চ মাসে যখন একটা চূড়ান্ত লড়াই শ্রমিকদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল এবং শ্রমিকরা তার মুখোমুখি হলেন, অভ্যুত্থান যখন একটা বাস্তব ঘটনায় পর্যবসিত হল, প্রতিকূল পূর্বলক্ষণ সত্ত্বেও মার্ক্স এই সর্বহারা বিপ্লবকে অসীম উদ্দীপনার সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। মার্ক্সবাদের পথ থেকে ভ্রষ্ট, রাশিয়ার কুখ্যাত প্লেখানভের মতো কট্টর পণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মার্ক্স এই আন্দোলন 'অসময়োচিত' বলে এর নিন্দা করেননি। প্লেখানভ ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম প্রসঙ্গে উদ্দীপনার সাথে লিখেছিলেন, কিন্তু ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসের পর এই প্লেখানভই উদারনীতিকদের ঢঙে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়া ওদের উচিত হয়নি।'

যাই হোক, কমিউনার্ডরা 'স্বর্গ অধিকারের অসমসাহসী অভিযানে নেমেছিল'— এই মন্তব্য করে মার্ক্স কমিউনার্ডদের বীরত্ব নিয়ে শুধু উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করেননি, যদিও জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি, তবুও মার্ক্স এই সংগ্রামকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বলে মনে করতেন। একে মনে করতেন, বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের এক ধাপ অগ্রগতি। মনে করতেন, এ এমন একটা বাস্তব পদক্ষেপ যা শত সহস্র যুক্তিজাল ও কর্মসূচির তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মার্ক্স নিজের জন্য যে কর্তব্য নির্ধারণ করেছিলেন তা হল— এই পরীক্ষার অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করতে হবে, এর থেকে রণকৌশলগত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, এর আলোকে নিজের তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।

প্যারিস কমিউনার্ডদের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্ক্স কমিউনিস্ট ইশতেহারের একটা মাত্র 'সংশোধন' করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন।

মার্কস-এঙ্গেলস ১৮৭২ সালের ২৪ জুন কমিউনিস্ট ইশতেহারের নতুন জার্মান সংস্করণের সর্বশেষ ভূমিকা লিখেছিলেন। এই ভূমিকায় তাঁরা লিখেছিলেন, কমিউনিস্ট ইশতেহারের কর্মসূচি 'কোনও কোনও বিষয়ে অকার্যকর হয়ে গেছে'। তাঁরা আরও বললেন ঃ

কমিউন বিশেষভাবে একটা জিনিস প্রমাণ করেছে। তা হল শ্রমিক শ্রেণি কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রযন্ত্রকে দখল করলেই নিজের স্বার্থে তাকে ব্যবহার করতে পারে না।

সুতরাং মার্কস-এঙ্গেলস প্যারিস কমিউনের একটা প্রধান ও মৌলিক শিক্ষাকে এতই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন যে, তাঁরা কমিউনিস্ট ইশতেহারের বিশেষ সংশোধন হিসাবে তা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

এটা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ যে, সুবিধাবাদীরা এই গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীকেই বিকৃত করেছে। কমিউনিস্ট ইশতেহারের পাঠকদের মধ্যে একশো ভাগের নিরানব্বই ভাগ যদি নাও হয়, অন্তত নব্বই জনই সম্ভবত এর অর্থ বোঝেন না। পরে এই বিকৃতি নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব। আলোচনা করব বিশেষভাবে বিকৃতি নিয়ে একটা অধ্যায়ে। এখানে উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে, মার্ক্সের যে বিখ্যাত বক্তব্য এইমাত্র উদ্ধৃত করা হল, তাকে এমন স্থূলভাবে বিকৃত করা হয়, যেন মার্ক্স ক্ষমতা দখল সহ অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তে ধীরগতিতে বিকাশের উপর জোর দিয়েছেন।

বাস্তবে, এর বিপরীতটাই সত্য। মার্কসের অভিমত হল, শ্রমিক শ্রেণিকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে, একে শুধু দখল করলেই চলবে না।

১৮৭১ সালের ১২ এপ্রিল, অর্থাৎ ঠিক প্যারিস কমিউনের সময়ে কুগেলমানকে মার্ক্স লিখেছিলেন ঃ

'আপনি যদি আমার অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারের শেষ অধ্যায়টা দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন, আমি বলেছি, আমলাতান্ত্রিক-সামরিক যন্ত্রটার আগের মতো হাত বদল করলেই চলবে না। আমি বলেছি, পরবর্তী ফরাসি বিপ্লবের প্রচেষ্টা হবে একে ধ্বংস করা। এবং এই মহাদেশে প্রতিটি সত্যিকারের গণবিপ্লবের এই হবে প্রাথমিক শর্ত। প্যারিসে আমাদের বীর কমরেডরা ঠিক এই কাজটা করারই চেষ্টা করছেন। (নিউয়ে জাইট, ২০ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৯০১-১৯০২, পৃঃ ৭০৯) (কুগেলমানের কাছে লেখা মার্ক্সের চিঠিগুলি রুশ ভাষায় অন্তত দুটি সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। আমি একটির সম্পাদনা করেছি এবং তার ভূমিকা লিখেছি)।

বিপ্লবের সময়ে রাষ্ট্র প্রসঙ্গে সর্বহারা শ্রেণির কর্তব্য সম্পর্কে মার্ক্সবাদের প্রধান শিক্ষা সংক্ষেপে এই শব্দগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে— 'আমলাতান্ত্রিক-সামরিক বাহিনীকে ধ্বংস করতে হবে'। এবং সংক্ষেপে মার্ক্সের এই শিক্ষাকেই শুধু একেবারে ভুলে যাওয়া হয়েছে তাই নয়, বর্তমানে মার্ক্সবাদের কাউটস্কিপন্থী 'ব্যাখ্যা' একে একেবারেই বিকৃত করছে।

মার্ক্স যে অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারের কথা উল্লেখ করেছেন, আমরা তার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ পুরোপুরি উদ্ধৃত করলাম।

উপরে উদ্ধৃত মার্ক্সের যুক্তির বিশেষ করে দুটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। প্রথমত, তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত শুধু এই মহাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ১৮৭১ সালে দাঁড়িয়ে এই বিষয়টা বোঝা যায়। তখন ইংল্যান্ড ছিল একটা খাঁটি পুঁজিবাদী দেশের আদর্শ উদাহরণ। তখন সেখানে কোনও সামরিক চক্র ছিল না, এবং আমলাতন্ত্রও প্রায় অনুপস্থিত ছিল বলা চলে। প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংস করার প্রাথমিক শর্ত বাদ দিয়ে সেখানে বিপ্লব, এমনকি গণবিপ্লবও সম্ভব ছিল বলে মনে করা হত এবং বাস্তবে তা সম্ভব ছিল। এই কারণে মার্ক্স ইংল্যান্ডকে বাদ রেখেছিলেন।

বর্তমানে ১৯১৭ সালে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের যুগে মার্ক্স-কথিত এই বৈশিষ্ট্য আর কার্যকর নয়। সারা দুনিয়ায় অ্যাংলো স্যাক্সন 'স্বাধীনতার' সর্ববৃহৎ ও শেষ প্রতিনিধি হল ইংল্যান্ড ও আমেরিকা। এই অর্থে যে, এখানে কোনও সামরিক চক্র বা আমলাতন্ত্র ছিল না। কিন্তু আজ এই দুই দেশই গোটা ইউরোপ-জোড়া আমলাতান্ত্রিক-সামরিক প্রতিষ্ঠানের রক্তাক্ত পাঁকে পুরোপুরি ডুবে গেছে। সব কিছুই আজ এই আমলাতান্ত্রিক-সামরিক প্রতিষ্ঠানের অধীন, সব কিছুই আজ এর পদদলিত। বর্তমানে ইংল্যান্ডে এবং আমেরিকাতেও প্রতিটি যথার্থ গণবিপ্লবের শর্ত হল প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ করা, ধ্বংস করা। (এই দুই দেশই ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে 'ইউরোপীয়' সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী মাপকাঠি অনুযায়ী নিজেদের পূর্ণতা ও উৎকর্ষের চরম সীমায় নিয়ে গিয়েছে)

দ্বিতীয়ত, আমলাতান্ত্রিক-সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করাই হল প্রতিটি গণবিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত— মার্ক্সের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। যাঁরা মার্ক্সবাদী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে চান, রাশিয়ার সেই প্লেখানভপন্থী ও মেনশেভিক এবং স্ট্রুভের অনুগামীদের কাছে মার্ক্সের মুখে গণবিপ্লবের কথা অদ্ভুত শোনাতে পারে। তাঁরা হয়ত বলতে পারেন, এই সব কথা মার্ক্সের মুখ-ফসকে বেরিয়ে গিয়েছে। মার্ক্সবাদকে তাঁরা বিকৃত করতে করতে এমন শোচনীয় উদারনৈতিক মতবাদের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন যে, বুর্জোয়া বিপ্লব ও শ্রমিক বিপ্লবের মধ্যে বিরোধের অস্তিত্বের বাইরে আর কিছু তাঁরা দেখতে পান না। আর এই বিরোধেরও ব্যাখ্যা তাঁরা অত্যন্ত নিষ্প্রাণভাবে করেন।

বিশ শতকের বিপ্লবগুলিকে যদি আমরা উদাহরণ হিসাবে ধরি, তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে পর্তুগাল ও তুরস্কের বিপ্লব— এই দুই বিপ্লবই বুর্জোয়া বিপ্লব। এই দুই বিপ্লবের কোনওটাই গণবিপ্লব নয়। কারণ, এই দুই বিপ্লবের কোনটাতেই ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে লক্ষ্যণীয় মাত্রায় সক্রিয়ভাবে স্বাধীন চিত্তে অংশগ্রহণ করেনি। এর বিপরীতে, যদিও ১৯০৫-'০৭ সালের রাশিয়ার বুর্জোয়া বিপ্লব পর্তুগাল ও তুরস্কের বিপ্লবের মতো সেই ধরনের 'চমৎকার' সাফল্যের মুখ দেখেনি, তবুও সেই বিপ্লব নিঃসন্দেহে গণবিপ্লব। কারণ, এই বিপ্লবে শোষণ-নিপীড়ন বিধ্বস্ত সমাজের নিচুতলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ স্বাধীনভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এবং বিপ্লবের সমগ্র প্রবাহে তাদের দাবিদাওয়া পেশ করেছিল। তাঁরা পুরনো সমাজকে ভেঙে তাদের নিজেদের পথে একটা নতুন সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল।

১৮৭১ সালে ইউরোপে কোনও দেশেই সর্বহারা শ্রেণি সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। সেই বিপ্লবই গণবিপ্লব হতে পারত, তার প্রবাহে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে টেনে আনতে পারত, যদি সেই বিপ্লব নিজের গতিধারায় সর্বহারা ও কৃষক শ্রেণিকে নিয়ে আসতে পারত। জনসাধারণ তখন এই দুই শ্রেণিকে নিয়ে গঠিত ছিল। এই দুই শ্রেণি ঐক্যবদ্ধ ছিল, আমলাতান্ত্রিক-সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্র এই দুই শ্রেণিকে নির্যাতন, নিষ্পেষণ, শোষণ করে, তাই এই দুই শ্রেণি ঐক্যবদ্ধ। এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য, চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য এই ঐক্য জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের, শ্রমিক শ্রেণি ও অধিকাংশ কৃষকদের যথার্থ স্বার্থে প্রয়োজন ছিল। সর্বহারা শ্রেণির ও গরিব কৃষকদের মধ্যে স্বাধীন মৈত্রীর জন্য এটা প্রাথমিক শর্ত। এই ঐক্য ছাড়া গণতন্ত্র স্থায়ী হতে পারে না এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সবাই জানেন, প্যারিস কমিউন নিঃসন্দেহে এই ধরনের মৈত্রীর দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। যদিও আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নানা কারণের জন্য সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

কাজেই, যথার্থ গণবিপ্লবের কথা বলতে গিয়ে, মার্ক্স পেটি বুর্জোয়াদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা একটুও ভুলে যাননি (তাদের সম্পর্কে তিনি প্রায়ই অনেক কথা বলেছেন), ১৮৭১ সালের ইউরোপের অধিকাংশ দেশের শ্রেণি ভারসাম্যের বিষয়টি তিনি খুব গুরুত্ব দিয়ে হিসাবের মধ্যে রেখেছেন। অন্যদিকে তিনি বলেছেন, শ্রমিক, কৃষক— উভয়ের স্বার্থেই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করা দরকার। এই কাজ তাদের ঐক্যবদ্ধ করে, তাদের সামনে এক সাধারণ কর্তব্য উপস্থিত করে— 'পরজীবী' উচ্ছেদ করে সে জায়গায় নতুন কিছু প্রতিষ্ঠা করা।

সেই 'নতুন কিছু ঠিক কী?' (চলবে)

* প্যারিস কমিউন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যাঁরা লড়াই করেছিলেন, তাঁদের কমিউনার্ড বলা হয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

ছাত্র-যুবকর্মীরা রবীন মণ্ডলের জীবন থেকে শিক্ষা নিন

ছয়ের পাতার পর

এদের খোঁজও কেউ রাখে না। আর এই মাইগ্র্যান্ট লেবারদের মধ্যে একটা মাইগ্র্যান্ট কালচারও ডেভেলপ করে গেছে। এখানে কয়েকদিন, ওখানে কয়েকদিন, সেখানে কয়েকদিন— যেখানে যেমন কাজ জোটে ছুটে যায়। একদল ঘরেও ফিরে আসে না। এইরকম জীবন। গ্রামের মেয়েরা পর্যন্ত শহরে চলে যাচ্ছে। রোজগার করতে হবে ঘর-সংসার চালানোর জন্য। আবার মেয়েদের নিয়ে একটা বিরাট ব্যবসা চলছে। গ্রাম থেকে একদল তুলে নিয়ে যাচ্ছে চাকরি দেবে, কাজ দেবে বলে। প্রলোভন দেখিয়ে শহরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। বিক্রি করে দিচ্ছে বিদেশের বাজারে। এদের নিয়ে নোংরামি চলে। এইরকম এক দল গ্রামের গরিব পাড়ায় পাত্র নিয়ে আসে— বাবা-মায়ের হাতে ৫ হাজার, ১০ হাজার টাকা দেয়। বিয়ে করে সেই মেয়েকে নিয়ে যায়। তারপর দশদিন বিশদিন রেখে তাকে বিক্রি করে দেয়। সারা ভারতেই এই জিনিস হচ্ছে। আপনারা জানেন, ১৩ লক্ষ মহিলার খোঁজ নেই ভারতবর্ষে। কিছুদিন আগে কাগজে বেরোল এই খবর। কোথায় গেল তারা?

এই হচ্ছে দেশের অবস্থা! লক্ষ লক্ষ কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কোটি কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। একদিকে আম্বানি আদানি টাটা জিন্দাল মিত্তাল— এই কয়েকজন, যাদের প্রতি ঘণ্টায় কয়েক হাজার কোটি টাকা মুনাফা হচ্ছে। আর দেশের ৮০ কোটি লোক রিক্ত, নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। গোটা দেশের অবস্থা হচ্ছে এই।

এই হচ্ছে ভারতের চেহারা। এই পুঁজিবাদের হয়ে যারা কাজ করছে— এই বিজেপি, কংগ্রেস, এই সমস্ত দল। এমনকি সিপিএম যখন সরকারে ছিল, তারাও পুঁজিবাদের হয়ে কাজ করেছে। নন্দীগ্রামের জমি বহুজাতিক সালিম কোম্পানিকে দিচ্ছিল কৃষকদের উচ্ছেদ করে। সিঙ্গুরে দিয়েছিল টাটাকে, যার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছিলাম, আপনারা জানেন।

তা হলে, রাজনীতি দুটি, সমাজও দুটি। একটা হচ্ছে শোষক শ্রেণি, পুঁজিপতি শ্রেণি। তারা মুষ্টিমেয়। কিন্তু তারাই সমস্ত সম্পদের মালিক। গরিবের রক্ত শোষণ করে, নিঃস্ব করে, তাদের শোষণযন্ত্রে গরিবের হাড় চূর্ণবিচূর্ণ করে তারা মুনাফা লুটছে। আর কোটি কোটি মানুষ পথের ভিখারি হচ্ছে। এখনও যারা মধ্যবিত্ত, তারা নিম্নমধ্যবিত্ত হবে। নিম্নমধ্যবিত্ত নিঃস্ব হবে। এই হচ্ছে পুঁজিবাদ। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, এই পুঁজিবাদ জনগণের শত্রু। এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আর লড়বে কারা? শোষিত শ্রমিক, শোষিত গরিব কৃষক, খেতমজুর। ফলে রাজনীতি দুটি। এই দলগুলো সবই হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণির দল। পুঁজিপতিদের টাকায় তারা চলে। তাদের সংবাদপত্র, তাদের টিভিতে তাদের প্রচার চলে। আর এই একটি মাত্র দল, যেটি শোষিত গরিব মানুষের দল। এ দল মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে টানে না। মানুষের কাছে হাত পাতে চাঁদার জন্য। তার ভিত্তিতে এ দল চলে। এই দল মানুষকে নীতি-আদর্শের কথা বলে। এ দল মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে, আগেকার দিনের বড় মানুষদের চরিত্র থেকে শিক্ষা নাও। পুরনো দিনের বড় মানুষ যাঁরা ছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, সুভাষ চন্দ্র বসু— এঁদের থেকে শিক্ষা নাও। শহিদ ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, আসফাকউল্লা খানের থেকে শিক্ষা নাও। আমরা প্রচার করি— কানাইলাল ভট্টাচার্যের থেকে শিক্ষা নাও। আমরা তা করি যুবকদের মধ্যে আবার নতুন প্রাণসঞ্চার করার জন্য। ওরা যুবকদের বলে— মদ খাও, জুয়া খেলো, সাট্টা খেলো, ড্রাগ অ্যাডিকশনে ভোগো, নারীদেহ নিয়ে নোংরা আলোচনায় মত্ত থাকো। রাস্তার অন্ধকারে নারীদের পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ো পশুর মতো। এই পুঁজিবাদ শুধু মানুষের মুখের আহার কেড়ে নিয়েছে, পথের ভিখারি করছে তাই নয়, পুঁজিবাদ মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করছে, চরিত্রকে ধ্বংস করছে। মানুষকে পশু বানিয়ে দিচ্ছে। এই যে এত নারীধর্ষণ— ভারতবর্ষে আগে কেউ দেখেছে? রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিদ্যাসাগর, সুভাষচন্দ্র দেখেছেন? এখন প্রতিদিন হাজার হাজার নারী ধর্ষিতা হচ্ছে। গণধর্ষিতা হচ্ছে। তিন বছরের চার বছরের শিশুকন্যা— তাকেও ধর্ষণ করে হত্যা করছে! বাবা মেয়েকে ধর্ষণ করছে! এমনকি আলিপুর কোর্টে কেস চলছে, মাকে ছেলে ধর্ষণ করেছে। এই পশ্চিমবাংলাতেই ঘটছে। এই যে নেতারা মঞ্চ আলো করে বসে থাকেন, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ভোট, গদি, মন্ত্রীত্ব। আর টাটা, আম্বানি, আদানিদের লক্ষ্য শুধু মুনাফা, আরও মুনাফা।

কমরেড শিবদাস ঘোষ এনেছেন মুক্তির বাণী। পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের শিক্ষা। এ জন্য দেখবেন আমাদের দলকে একসময় সিপিএম তাদের ফ্রন্টে যোগ দেওয়ার অফার করেছিল, আমরা যাইনি। তৃণমূল মন্ত্রীত্বের অফার পর্যন্ত করেছিল— আমরা যাইনি। আমরা বলেছি, এই দল বিপ্লবের আদর্শে গড়ে উঠেছে। আমরা ভোটসর্বস্ব পার্টি নই। আমাদের বামপন্থা বিপ্লবী বামপন্থা, সংগ্রামী বামপন্থা। সিপিএমের বামপন্থা গদিলোভী বামপন্থা, ভোটসর্বস্ব বামপন্থা। তারা যথার্থ মার্ক্সবাদী নয়। যথার্থ কমিউনিস্ট নয়। ওরা মার্ক্সবাদকে, কমিউনিজমকে কলঙ্কিত করেছে। আমরা মার্ক্সবাদ-কমিউনিজমের মর্যাদা রক্ষা করছি। কমরেড শিবদাস ঘোষ যে সংগ্রামের সূচনা করেছেন কমরেড রবীন মণ্ডল সেই সংগ্রামের অন্যতম অগ্রগণ্য বীর যোদ্ধা ছিলেন। আজীবন তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে বুকে বহন করেছেন। রোগশয্যায় যখন ছিলেন, চলৎশক্তিহীন, দৃষ্টিশক্তিহীন, তখনও তিনি শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে বুকে বহন করেছেন। আমি কমরেডদের বলব, সমর্থকদের বলব— এখান থেকে শিক্ষা নিতে, তাঁকে স্মরণ করার, যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের তাৎপর্য এখানেই। আজ গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে হাজার হাজার এই ধরনের বীর বিপ্লবী যোদ্ধার জন্ম হওয়া প্রয়োজন, যারা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমৃত্যু বিপ্লবের ঝান্ডা বহন করে যাবে।

শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের তীব্র নিন্দা

এসইউসিআই(সি) বিহার রাজ্য কমিটির

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার (জেডিইউ) পরিচালিত বিহার রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগ বিক্ষোভ প্রদর্শন, ধর্মঘট ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

এস ইউ সি আই (সি)-র বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ সিংহ ৩০ নভেম্বর এই নির্দেশকে অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী আখ্যা দিয়ে তার তীব্র নিন্দা করেন। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র, যুব সংগঠনগুলি সহ রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে অবিলম্বে এই নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবিতে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

বাংলাদেশে তদারকি সরকারের দাবি না মানায় নির্বাচন বয়কট করবে বাসদ (মার্ক্সবাদী)

বাংলাদেশে সম্প্রতি যে নির্বাচন ঘোষিত হয়েছে, তাকে প্রহসন আখ্যা দিয়ে বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা বলেন, আওয়ামি লিগ সরকারের তল্পিবাহক নির্বাচন কমিশন একতরফা ভাবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে। বাসদ (মার্ক্সবাদী) সহ বাম গণতান্ত্রিক জোট ও বিরোধী দলগুলির অধিকাংশই এই তফসিল প্রত্যাখ্যান করেছে। আপেক্ষিক অর্থে তদারকি সরকারের অধীনে সুষ্ঠ নির্বাচনের দাবিতে প্রায় সকল বিরোধী দল ও জনগণ আন্দোলনরত থাকলেও এই গণদাবিকে উপেক্ষা করে আওয়ামি লিগ সরকার আর একটি সাজানো নির্বাচনের আয়োজন করতে যাচ্ছে।

২০১৪ সালে একতরফা ও ২০১৮ সালে পুলিশ, প্রশাসন, রাষ্ট্রযন্ত্র ও দলীয় বাহিনী দিয়ে ভোট ডাকাতির মধ্য দিয়ে আওয়ামি লিগ ক্ষমতাসীন হয়েছে। স্বাধীনতার পর এখনও পর্যন্ত এ দেশের শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোনও গণতান্ত্রিক কাঠামো দেয়নি। যারাই ক্ষমতায় এসেছে, সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে দলীয়করণ করেছে। ফলে একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গড়ে ওঠেনি। দেশে দলীয় সরকারের অধীনে ৫৩ বছরে যতবার নির্বাচন হয়েছে, ততবারই ক্ষমতাসীন দল কারসাজি করে জয়ী হয়েছে।

অতীতের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা ও বর্তমান জুলুমের শাসনে এটা ইতিমধ্যেই দেশের জনগণের কাছে স্পষ্ট— আওয়ামি লিগ সরকারের অধীনে ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির নির্বাচন সুষ্ঠু, গণতান্ত্রিক এবং গ্রহণযোগ্য হবে না। যে গণতান্ত্রিক ও শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, অসংখ্য প্রাণের আত্মাহুতি ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল— শহিদদের স্বপ্নের সেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আজ কী করুণ পরিণতি! কোথায় তা হলে গণতন্ত্র? কোথায় স্বাধীনতা?

দেশের বৃহৎ পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের সমর্থনে ভারত, চিন, আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়া, জাপানের মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে লঙ্ঘন করে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে। এই শক্তিগুলোর কেউ আওয়ামি লিগের পক্ষে, কেউ বিএনপি-র পক্ষে দাঁড়িয়েছে। তারা গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। বাস্তবে তারা বাংলাদেশের বাজারে নিজেদের লগ্নিকে সুরক্ষিত ও বৃদ্ধি করতে চাইছে। আমরা এই সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, নির্বাচন যদি সুষ্ঠুভাবে করতে হয়, তা হলে একতরফা নির্বাচনের আয়োজন বাতিল, নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের অধিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র রক্ষাকবচ হচ্ছে গণআন্দোলন। গণতান্ত্রিক এই দাবি তখনই আদায় হতে পারে যখন লক্ষ লক্ষ জনগণ সঙ্ঘবদ্ধ, সচেতন, ঐক্যবদ্ধ, দীর্ঘস্থায়ী লড়াই গড়ে তুলবে। একটা রাজনৈতিক দল, কিংবা জোট আন্দোলন করে এই দাবি আদায় করতে পারবে না। শুধুমাত্র অধিকার অর্জন নয়, অধিকার রক্ষা করার শর্তও হচ্ছে জনগণের ঐক্যবদ্ধতা ও গণআন্দোলন। যদি জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি গড়ে না ওঠে, গণআন্দোলনের শক্তি গড়ে না ওঠে— তা হলে যে বড় দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন— সে আওয়ামি লিগ সরকারের মতোই ফ্যাসিবাদ কায়েম করবে। তাই স্বাধীন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি ও সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান— আওয়ামি লিগ সরকারের অধীন একতরফা নির্বাচনকে সর্বাত্মক বয়কট করুন।

অমিতাভ চ্যাটার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত
সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com